গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১৭ - ২৩ নভেম্বর ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সকল দণ্ডাদেশ বাতিল করতে হবে

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ও তাঁর দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে বাগদাদে আমেরিকার তৈরি আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিবাদ ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। ইরাকের স্বাধীনতাকামী জনগণ জ্বলে উঠেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঘৃণায়। প্রতিরোধ যুদ্ধ অবদমিত হওয়ার বদলে নতুন তেজে তারা আক্রমণ হানছে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে। 'গণতন্ত্র বনাম সন্ত্রাসবাদ', 'খ্রীষ্টধর্ম বনাম ইসলাম', 'শিয়া-সুন্নি বিরোধ ও দাঙ্গা' ইত্যাদি কোনকিছু দিয়েই ইরাকি জনগণের প্রতিরোধকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাঙতে পারেনি। বিশ্বজোড়া প্রতিবাদে কণ্ঠ মিলিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে বলেছেন, সাজানো বিচারের মধ্য দিয়ে দেওয়া এই রায় আইনের মুখোশে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে খুন করারই ঘোষণা।

আমেরিকা নিরন্তর প্রচার চালিয়ে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সাদ্দাম হুসেন একজন রক্তপিপাসু একনায়ক এবং এমন একজন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি যিনি ইচ্ছামতো যেকোন সময় পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে গোটা বিশ্বকে ছারখার করে দিতে পারেন, বিশ্বের সর্বত্র সকল সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের তিনি মদত দেন। অথচ, ১৫ বছর ধরে ইরাকের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ যুদ্ধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে লক্ষ লক্ষ ইরাকিকে হত্যা

পাঁচের পাতায় দেখুন

৮ নভেম্বর কলকাতায় মার্কিন দপ্তর অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ

অবিলম্বে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমাবার দাবি জানাল এস ইউ সি আই

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে ব্যারেল প্রতি ৫৮ ডলারে নেমে আসায় অবিলম্বে ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমাবার দাবি করেছেন এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। ৯ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি বলেন, সিপিএম-সিপিআই সমর্থিত ইউ পি এ সরকার ইতিপূর্বে দফায় দফায় তেলের দাম বাড়াবার সময় যুক্তি দিয়েছিল যে, বিশ্ববাজারে উত্তরোত্তর দাম বাড়ার ফলেই সরকার দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে এবং দাম না বাড়ানো হলে ভারতীয় বিশাল তেল কোম্পানিগুলির প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। আমরা তখনই বলেছিলাম যে, প্রথমত, তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফার পরিমাণে কিছু হ্রাসকেই ক্ষতি বলে দেখানো হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, তেলের উপর চাপানো সরকারি করের বোঝা কিছুটা কমালেই বিশ্ববাজারে তেলের দামবৃদ্ধির চাপকে ঠেকানো সম্ভব। যাই হোক, আজ যখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমেছে তখন ভারতে তেলের দাম না কমানোর এবং জনগণকে স্বস্তি না দেওয়ার কোনও যুক্তিই সরকারের থাকতে পারে না। এই দাবিতে সরকারের উপর আন্দোলনের চাপ সৃষ্টির জন্য জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কমরেড নীহার মুখার্জী।

কুলতলি ঃ দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিবাদে বর্গাদার-পাট্টাদারদের আমরণ অনশন

নতি স্বীকারে বাধ্য হ'ল সরকার

কুলতলি এলাকার সঙ্গে মিশে আছে শোষণ-বঞ্চনা, শাসক দলের সন্ত্রাস ও চরম দুর্নীতি এবং নিপীড়িত মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বহু শহীদের আত্মবলিদান।

গত ১ থেকে ৩ নভেম্বর আবার সূচিত হ'ল আর একটি সংগ্রামের বিজয়।

দীর্ঘদিন ধরে কুলতলিতে পাট্টাদার-বর্গাদারদের জমি নথিভুক্ত করার কাজ অসৎ উদ্দেশ্যে বন্ধ ছিল। ২০০১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে সহস্রাধিক কৃষক আলিপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আমরণ অনশনে সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী অনশন প্রত্যাহার করে আলোচনার প্রস্তাব দিলে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসা হয়। তিনি ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীকে অবিলম্বে পাট্টাদার ও বর্গাদারদের জমি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে মাত্র ২৫০০ বর্গাদারের জমি নথিভুক্ত করার পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বাকি প্রায় ৫০০০ বর্গাদার জমি হারাবার আতঙ্কে দিন কাটাতে থাকেন।

এছাড়া ১০০ দিনের কাজের 'জব কার্ড' বিলিও কার্যকর করা হয়নি। ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে বন্যাত্রাণের টাকা সিপিএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির দুর্নীতির ফলে বন্যাদুর্গতদের কাছে পৌঁছায়নি।

মূলত এই দাবিগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলা সত্ত্বেও সরকার বা প্রশাসন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

ফলে গত ১ নভেম্বর থেকে ৭২ জন মহিলা সমেত ৩২১ জন কৃষক, বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে কুলতলি বিডিও অফিসের মাঠে আমরণ অনশনে সামিল হন। ঐদিন অনশনের শুরুতে প্রবীণ কৃষক নেতা, এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান অনশনকারীদের উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, ''বহু শহীদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে গড়ে ওঠা কুলতলির মাটিতে আপনারা যে মরণপণ সংগ্রামে সামিল হয়েছেন, তা শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন। আমি বিশ্বাস করি, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আপনারা লড়াই চালিয়ে যাবেন।'' এরপর সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত গান পরিবেশন করা হয় এবং শহীদ যতীন দাসের ছবিতে মাল্যদান করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অনশনে বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার (ডাইনে) সহ অন্যান্যরা

খড়্গপুরে কৃষকদের শপথ

বিনা যুদ্ধে কৃষিজমি ছাড়ব না

শিল্পায়নের নাম করে খড়্গপুর ১ ও ২নং ব্লকের লছমাপুর ও বড়কলা অঞ্চলের ১২৮০ একর কৃষিজমি ও বাস্তুজমি অধিগ্রহণ করে টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির ডাকে ৭ নভেম্বর জফলা স্কুল মাঠে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার শত শত কৃষক এবং খেতমজুর এই সভায় যোগ দেন। চাষীরা শপথ নেন, বিনা যুদ্ধে আমরা পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া দো-তিন ফসলি কৃষিজমি শিল্পের নামে দেব না। জমি নিতে এলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের হাতে রক্ত লাগাতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির সভাপতি গৌরহরি ঘোষ। কমিটির অন্যতম সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহু ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষিজমি বাঁচাও আন্দোলনের জেলা নেতা পঞ্চানন প্রধান এবং সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। বক্তারা বলেন, ফলতা, রাজারহাট, কল্যাণী প্রভৃতি এলাকায় শিল্পের নামে কৃষকদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি অধিগ্রহণ করা হলেও

সাতের পাতায় দেখুন

পশ্চিম মেদিনীপুর

ন্যাপথালিন কারখানার ভয়াবহ দূষণ প্রতিরোধে আন্দোলন

বেলদা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের ন্যাপথালিন বল তৈরির কারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকে জল-মাটি দূষণে এলাকার কৃষ্ণপুর, রঘুনাথপুর, আকন্দা গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ আক্রান্ত। যারা ওই এলাকার জল ব্যবহার করছেন তাদের পেটের যন্ত্রণা, স্নায়ুরোগ, রক্তাল্পতা, গর্ভবতী মায়েদের সন্তানের ক্ষতি সহ নানা রোগের শিকার হতে হচ্ছে। বিষাক্ত দূষণ থেকে পুকুরের মাছ, গাছের ফলও রেহাই পায়নি।

'৮৭ সালে গড়ে ওঠা এই কারখানার বর্জ্য বিষ কারখানা সন্নিহিত স্থানে ফেলার দরুণ এলাকার ভূগর্ভস্থ জলের উৎসকেই তা বিষিয়ে তুলেছে। বর্জ্য পদার্থের মধ্যে রয়েছে টার অ্যাসিড, ফেনল, ন্যাপথার মতো তীব্র বিষাক্ত রাসায়নিক। বিচারপতি গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন পরিবেশ বিষয়ক আপিল আদালতের নির্দেশে চার সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি এলাকা ঘুরে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল ঐ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, সেই সঙ্গে পরিবেশ মূল্য হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা, এ যাবৎ যা ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ এবং এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্বও কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। কারখানা বন্ধ হলেও অন্যান্য নির্দেশগুলি কারখানা কর্তৃপক্ষ এখনও রূপায়ণ করেনি।

ফলে ভুক্তভোগীরা এ বছরের শুরুতে এক কনভেনশন করে 'পানীয় জল দূষণ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করে আন্দোলন চালাচ্ছেন। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৭ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক বরেন্দ্রনাথ বেরা, দীপক চন্দ্র, সমীর রায়। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি রাধাকান্ত মাইতি, পঞ্চানন প্রধান এবং নারায়ণচন্দ্র নায়ক।

মুর্শিদাবাদ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বিডিও ডেপুটেশন

সুতী ১নং ব্লকের চারটি অঞ্চল প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ছে, ফলে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে এলাকার মানুষের জন্য এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট অপেক্ষা করছে। প্রতি বছর বন্যার সময় শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী, আমলারা আসেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, কিন্তু বাস্তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই সুতী আঞ্চলিক কমিটি। গত ৩০ অক্টোবর কমিটির পক্ষ থেকে সুতী ১নং ব্লকের বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয়ঃ (১) সার্বিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; (২) কৃষক সহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ফসল না ওঠা পর্যন্ত রিলিফের কাজ চালিয়ে যেতে হবে; (৩) কৃষিঋণ মকুব করতে হবে এবং ভর্তুকিতে সার ও বীজ সরবরাহ করতে হবে; (৪) সরকারিভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন তা না হচ্ছে কৃষকদের একর প্রতি ৩০০ লিটার করমুক্ত ডিজেল দিতে হবে; (৫) বংশবাটি বিলে যে সমস্ত জমি ডুবে আছে তার খাজনা মকুব করতে হবে; (৬) মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে কোন কর আদায় করা চলবে না; (৭) যে জমিতে বালি পড়ে চাষের অযোগ্য হয়ে গেছে সেগুলিতে বালি তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস্ সুবোধ দাস, মোঃ সামিরুদ্দিন, শিশির সিংহ, সুধীর ভাস্কর, পবন মণ্ডল ও সনাতন মণ্ডল।

বীরভূম

আন্দোলনের চাপে ১০০ দিনের কাজ

বোলপুর মহকুমায় সান্তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদবপুর গ্রামে ১০০ দিনের কাজের রূপায়ণে সিপিএম নেতারা ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অনিয়ম চালাচ্ছিল। ঐ নেতারা জব কার্ডধারী দিনমজুরদের মাত্র ২৫/২৬ দিনের কাজ দিয়ে বন্ধ করে দেয়। দিনমজুরদের জব কার্ড জমা নিয়ে ফেরত দিতে চায় না। এমতাবস্থায় এস ইউ সি আই বোলপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে দিনমজুরেরা সংগঠিত হয়। কাজের দাবিতে গ্রামে গ্রামে মিছিল করে, পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেয়। এতেও কোন ফল না হওয়ায় ক্ষুব্ধ দিনমজুররা গত ১ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে বোলপুর শহরে মিছিল করে এবং মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেয়, মহকুমা শাসক তদন্তের আশ্বাস দেন। ফলশ্রুতিতে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পুনরায় ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ প্রশান্ত চ্যাটার্জী, শম্ভু ব্যানার্জী, বিজয় দলুই প্রমুখ।

নদীয়া

সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার বাসিন্দারা

সমাজবিরোধীদের দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ফয়দা তোলার রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'রাধাকান্তপুর নাগরিক ও শান্তি কমিটি'। গত ১ নভেম্বর রাত্রি ১১টার সময় সিপিএম আশ্রিত একদল সমাজবিরোধী পিস্তল, পাইপগান, বোমা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈধ রান্নাঘর তৈরি করে। ৩ ফুট জায়গাও না ছাড়ায় রাধাকান্তপুর মাধ্যমিক কেন্দ্রের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। পানিঘাটা পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান ও উপপ্রধান এই সমাজবিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে সাধারণ মানুষ নয়, তাদের নিয়ন্ত্রিত সমাজবিরোধীরাই শেষ কথা বলবে। কিন্তু বাদ সাধলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। সমাজবিরোধী অপকর্ম রুখতে তাঁরা এলাকার শত শত মানুষের উপস্থিতিতে গত ২ নভেম্বর নাগরিক কনভেনশন করে গড়ে তুলেছেন নাগরিক ও শান্তি কমিটি। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন আজাহারুল ইসলাম ও কামাল-উদ্দিন সেখ। সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কমিটির উদ্যোগে ৫ নভেম্বর থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়।

কোচবিহার

শালটিয়া নদী সংস্কারের দাবিতে ডেপুটেশন

গত ১ নভেম্বর কোচবিহার সদর মহকুমার অন্তর্গত শালটিয়া নদীর ভূমিক্ষয় ও ভাঙনরোধ, সার্বিক সেচের উন্নয়ন সহ সামগ্রিক ভূমি সমস্যার সমীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালায় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের চেয়ারম্যান গবেষক ও ভূবিজ্ঞানী মিস্টার শাস্ত্রী, মি. চাওলা ও জলসম্পদ মন্ত্রকের বিশেষ আধিকারিক মি. ভট্টাচার্য সহ বিশেষ প্রতিনিধি দল। 'শালটিয়া নদী সামগ্রিক উন্নয়ন কমিটি'-র ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্রীয় সরকার এই সমীক্ষক দলকে পাঠিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলকে স্মারকলিপি দিচ্ছেন উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা

গত ৩ নভেম্বর মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজ চলাকালীন উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক নৃপেন কার্যী, সভাপতি প্রফুল্লকুমার লস্কর ও বিশিষ্ট সদস্য জিতেন রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং জনগণের মতামত ও প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করেন। ভবিষ্যতে শালটিয়া নদীর উৎসস্থল পরিদর্শন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়।

উন্নয়ন কমিটির দাবি ছিল ঃ শালটিয়া নদীর উজানে বামনি নদীর গতিধারাকে '৮০-র দশকে যেদিকে ছিল সেদিকেই প্রবাহিত করতে হবে; একেবারে উজানে শালটিয়া-বামনির সংযোগস্থলে ও ভাটিতে শালটিয়া-ঝলঝলি নদীর মিলনস্থলে মজবুত বাঁধ, স্লুইস গেট নির্মাণ করতে হবে; কৃষিসেচের সুবিধার্থে মধ্যবর্তী মৌজাগুলিতে বাঁধ, স্লুইস গেট নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে; পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান ও নেপালের নির্মিত প্রজেক্টগুলি শালটিয়া নদীর ধ্বংসাত্মক মূর্তির কারণ কি না তা পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করতে হবে। এর সঙ্গে অবৈজ্ঞানিকভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন, বাঁধ, সড়ক নির্মাণ, বালিপাথর ও পাহাড় ভেঙে পাথর সংগ্রহ ও ব্যবসায়ীকরণ এবং ব্যাপক বনাঞ্চল ধ্বংস পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে নদীভাঙনের কারণ নির্ধারণ করতে হবে।

পূর্ব মেদিনীপুর

জেলাশাসক অফিসে মহিলাদের অবস্থান

গত ৬ নভেম্বর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলাশাসক অফিসে অবস্থান করেন।

স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা, ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স, কৃষিজমি অধিগ্রহণ, নারীপাচার, নারীনির্যাতন, টিভি, পত্রপত্রিকায় ও ভিডিও হলে অশ্লীলতার প্রচারের প্রতিবাদে ও নারী নিরাপত্তার দাবিতে এই ডেপুটেশন ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। এই অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লেখা রায়, জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি এবং কমরেডস্ প্রতিমা অধিকারী, শীলা দাস, পুতুল মাইতি, রীতা ওঝা, বেলা পাঁজা প্রমুখ। অবস্থানমঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করে এম এস এস সঙ্গীত গোষ্ঠী, আবৃত্তি পরিবেশন করেন অলকা অধিকারী।

জেলা সম্পাদিকার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করে আলোচনা করেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর

অন্যায় ট্যাক্স প্রত্যাহারের আন্দোলনে সমিতি গঠন

মেদিনীপুর সদর ব্লকের অধীন ২নং চাঁদড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নিবন্ধীকরণ ফি-এর নাম করে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বকেয়া হিসাবে ১৫০ টাকা থেকে ২২৫০ টাকা কিংবা তারও বেশি ট্যাক্স দোকানদারদের কাছ থেকে আদায়ের জন্য নোটিশ জারি করেছে। মেদিনীপুর সদর ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র চাঁদড়া গ্রাম পঞ্চায়েতই এই ট্যাক্স চালু করতে চাইছে। দেখা যাচ্ছে, সবজি দোকানি, পানগুমটির উপরও বিপুল ট্যাক্স বসছে। এমনকী যারা দুই/তিন মাস দোকান করেছে তাদের কাছেও তিন বছরের বকেয়া ট্যাক্সের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্রতিবন্ধী দোকানদারদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর স্থানীয় চিলগোড়ায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পশ্চিম মেদিনীপুর ডিসস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের চিফ্ অ্যাডভাইসার ভানুরতন গুইন এবং সারা বাংলা হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর দাস বক্তব্য রাখেন। এলাকার বক্তারাও এই ট্যাক্স চালুর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিডিওর কাছে ও পঞ্চায়েত অফিসে এই ট্যাক্স তুলে নেওয়ার জন্য দাবি জানানো হবে। কর্তৃপক্ষ ট্যাক্স প্রত্যাহার না করলে আগামী দিনে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে বলে জানানো হয়। শীতল চন্দ্র দাসকে সভাপতি এবং নয়নকুমার দে ও রমেন মালকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ১২৫ জনের দোকানদার ও ব্যবসায়ী সমিতি গঠিত হয়েছে।

কিট কেলেঙ্কারি

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থাই নগ্ন হল

বেশ কিছুদিন যাবৎ কিট কেলেঙ্কারির সূত্রে 'মনোজাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করে রেখেছে। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের বদান্যতায় এই কোম্পানি কেন্দ্রীয় ব্লাডব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে গত দেড় বছরের অধিক সময় ধরে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ রক্তপরীক্ষার কিট সরবরাহ করেছে। এই কিটের সাহায্যে সংগৃহীত রক্তে এইডস্, জন্ডিস ইত্যাদি আছে কি না তার প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই দেড় বছরে অসংখ্য রোগী, যাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রক্তগ্রহণ করেছেন তাঁদের অনেকেই এইডস্, হেপাটাইটিস বি, সি-এর মতো মারণরোগে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। কতজন আক্রান্ত হয়েছেন তা কেউ জানে না। তাদের পরিবার পরিজনেরা আজ দিশেহারা, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত যে রোগীদের মাসে মাসে রক্ত নিতে হয়েছে, তাঁদের মা-বাবা সহ পরিবারের লোকেরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন এটা জানার জন্য যে তাঁদের রোগী এরকম কোন মারণ রোগের শিকার হয়েছে কি না। এক রোগের চিকিৎসা করাতে এসে তাঁর শিশুটির বা ঘরের অন্য কোন রোগীর শরীরে যে এভাবে অন্য এক মারণরোগের বিষ ঢুকে যাবে একথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে তাঁদের। বাস্তবে এ হল, ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যার ষড়যন্ত্র। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বামপন্থী নাম নিয়ে যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের প্রশ্রয় ছাড়া এ কাজ করা কোনও ব্যবসায়ীর পক্ষে কি সম্ভব? মানুষের মধ্যে প্রবল আলোচনা এবং প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত করে দোষীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া যখন সরকারের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হওয়ার কথা সেখানে প্রথমে সিবিআই তদন্তে গররাজি হয়ে এবং স্বাস্থ্যদপ্তরকে ক্লিনচিট দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার স্বার্থ আগলাতে চাইছেন? সংবাদে প্রকাশ, কয়েকবছর আগেই আসাম সরকার মনোজাইম ইন্ডিয়াকে আসামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কে মনোজাইমের রিপোর্ট ভুল হওয়ায় স্বাস্থ্যভবনে এই কিট বন্ধ করার চিঠি দেন সংশ্লিষ্ট সুপাররা। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে কাদের তৎপরতায় এবং কোন্ বিশেষ স্বার্থে তারা স্বাস্থ্যদপ্তরের ছাড়পত্র পেয়ে দেড় বছরের অধিক সময় ধরে এই মারণখেলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হল? প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন কতটুকু নিরাপদ? এরকম বহু প্রশ্ন আজ রাজ্যের মানুষের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে। সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার আগে খুবই সঙ্গতভাবে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, রাজ্যের মন্ত্রী, স্বাস্থ্যদপ্তর এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজশ ছাড়া এই মাপের কেলেঙ্কারি সংঘটিত হতে পারে না। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্য এত দূর যে, কিটগুলির মান পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। আসলে বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং চটকল মালিক, দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন হিসাবে খ্যাত গোবিন্দ সারদার সঙ্গে শাসক সিপিএমের দোস্তি এত গভীর যে কিটের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অসাধু মালিকের সার্টিফিকেট যাচাই করার চেষ্টাও সরকার করেনি। মনোজাইম কিট কেলেঙ্কারির ঘটনায় গোটা রাজ্যের মানুষ সম্প্রতি একটা জোরালো ধাক্কা খেলেও স্বাস্থ্য পরিষেবার নানা দুর্নীতির সূত্রপাত বহু বছর আগে থেকেই। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার অবাধ সুযোগের পাশাপাশি সকলের জন্য স্বাস্থ্যের দাবি ছিল অন্যতম। স্বাধীনতার পরই কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত 'মুদালিয়র কমিশন' কেন্দ্রীয় বাজেটের ন্যূনতম ১০% স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করার সুপারিশ করেছিল অথচ সম্পদের অভাবের চিরাচরিত বুলি আউড়ে প্রতিটি সরকারই স্বাস্থ্যখাতে খরচ কমিয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যেখানে ছিল মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৯৮% আজ তা ১ শতাংশেরও নীচে নেমে গেছে। স্বাধীনতার ঠিক পূর্বলগ্নে যোসেফ ভোরের নেতৃত্বে গঠিত Health Survey and Development Committee (1943-46) বলেছিল — 'মাঠের চাষীর উন্নয়নই হবে সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য। টাকা নেই বলে কেউ প্রতিষেধক ও রোগ নিরাময়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে — এ হতে পারে না।' একদা পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে বলেছিলেন ''এদেশে বহু রোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্যবিধানের জন্য রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থ কুলোয় না।...অথচ এদেশে শাসনব্যবস্থায় অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। আয় ব্যয়ের অজস্র পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ...হতভাগা আমরা পুলিশ ও ফৌজ বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টের কণা খুঁটে বিদ্যার ঠাট বজায় রাখছি ফাঁকা মালমশলায়।'' আর আজ আমাদের মত এই গরিব দেশের মিলিটারি খাতে আট দিনে যে ব্যয় হয় তা ১১০ কোটি মানুষের সারা বছরের স্বাস্থ্যখরচের সমান। সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যচিত্র দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন। স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তী বর্ষের দোরগোড়ায় এসেও বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ যক্ষ্মারোগী (দেড় কোটি), ৬০ শতাংশ নথিভুক্ত কুষ্ঠরোগী (৫.৩৮ লক্ষ), ৩৫ শতাংশ ফাইলেরিয়া রোগী, ৪০ শতাংশ পোলিও রোগীর মালিক আমাদের দেশ। এদেশে এক তৃতীয়াংশ শিশু জন্মগ্রহণ করে কম ওজন নিয়ে এবং বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মা ও শিশু এদেশে অপুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগে, শিশুমৃত্যু এবং প্রসবকালীন মৃত্যুর হারে এদেশ বিশ্বের প্রথম সারিতেই আছে।

স্বাস্থ্যের প্রতি প্রতিটি কেন্দ্রীয় সরকার কত উদাসীন ছিল তা বোঝা যায় যখন দেশের একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ৩৫ বছর কেটে যায়। ১৯৮৩ সালের সেই স্বাস্থ্যনীতিতে গালভরা নানা কথা থাকলেও 'আর্থিক অনটন ও প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে' সুফল পাওয়া যায়নি বলে সরকার স্বীকার করে নিয়েই ২০০২ সালে 'নয়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি' তৈরি করে। এই নীতি কত জনমুখী তা টের পাওয়া যায় যখন দেখা যায় জাতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা এবং বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির মালিকরা ওষুধ ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে গিয়ে ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া করে তুলেছে। সরকারি ঔদাসীন্য এবং ওষুধ ব্যবসায়ীদের নীতিহীন অর্থলিপ্সার ফলে এদেশের বাজারে এমন সব ওষুধপত্র চালানো হচ্ছে, যেগুলি ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হওয়ায় পাশ্চাত্য ও উন্নত দেশগুলিতে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। নানারকম 'নতুন' ওষুধ এবং রোগ জীবাণু পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে 'গিনিপিগ' হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে কাজাখস্তানের আলমা আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যের দাবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে ভারত যোগ দিয়েছিল। সেখানকার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক জুড়ে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিতে সারা দেশে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সরকারি প্রচার করা হয়েছিল। অথচ সরকারি এই প্রতিশ্রুতির ঘোষিত মাপকাঠি অনুযায়ী ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য পরিস্রুত পানীয় জল, সুষম খাদ্য ও জীবনদায়ী ওষুধের ব্যবস্থা করা সুদূরপরাহতই রয়ে গেল। তাই ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই সরকারি প্রতিশ্রুতি দেশবাসীর কাছে বিংশ শতাব্দীর এক নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যচিত্রও গোটা দেশের থেকে আলাদা তো নয়ই বরং অনেক ক্ষেত্রে তার রূপ আরও ভয়াবহ তা রাজ্যবাসী জানেন। ত্রিশ বছর ধরে এ রাজ্যে তথাকথিত বামপন্থী দলের নেতৃত্বে সরকার চলছে। তার আগে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল কংগ্রেস সরকার। সেই আমলে যেমন বছর বছর সরকারি বাজেটে পুলিশ-প্রশাসনিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই করা হত, এই আমলেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় আছে। সংবিধান রাজ্য সরকারগুলির ওপরেই রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়ার মূল দায়িত্ব দিয়েছে। গত তিরিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যবাসীকে কী পরিষেবা দিয়ে চলেছে তা দেখা যাক। রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া-অজানা জ্বর প্রতি বছর কেড়ে নেয় বহু তরতাজা প্রাণ। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার সহ গোটা জেলা ম্যালেরিয়াপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও শুধু সরকারি নজরদারির অভাবে শত শত মানুষের মৃত্যু এক সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে কিছুদিন অন্তর একসঙ্গে বহু শিশুর মৃত্যু সরকারের কাছে 'স্বাভাবিক ব্যাপার'। গ্রাম শহরের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুকুর বিড়াল ঘুরে বেড়ায়। থাকে না সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ — ফলে প্রতি বছর সাপ, কুকুরের কামড়ে প্রাণ যায় শত শত মানুষের। অজানা জ্বর নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার আগেই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা সহ বিভিন্ন জেলায় হারিয়ে যায় বহু প্রাণ। বন্যায়, জমা জলে আন্ত্রিক সহ বিভিন্ন পেটের রোগে ভোগে হাজার হাজার মানুষ। কত মারা যায় তার হিসাব থাকে না। কলকাতাসহ রাজ্যে মোট হাসপাতাল ৪৩৪টি এবং হেল্‌থ সেন্টার ১২৬৮টি। এই ১৭০২টি সরকারি হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাজ্যের ৮ কোটির ওপর মানুষের জন্য শয্যাসংখ্যা মাত্র ৭১,৩২৮টি। এর মধ্যে বহু জায়গায় ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী-টেকনিশিয়ান যতজন থাকার কথা, তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়েছে। হাসপাতালে নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ। তাছাড়া সরকারি পরিসংখ্যান থেকে বাস্তব অবস্থা আরও করুণ। এছাড়াও আছে হাসপাতালগুলিতে চুরি দুর্নীতি ও দুষ্টচক্রের রমরমা কারবার। পানীয় জলের অভাবে এরাজ্যের প্রায় তিন কোটি মানুষ আর্সেনিক যুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যের নয়টি জেলার নলকূপের জলে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ১২ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। কয়েকশত মানুষ মারা গেছেন এবং মৃত্যুর দিন গুনছে হাজার হাজার রোগী। সরকারি চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। কারণ সরকারের নাকি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কিট কেলেঙ্কারি ও শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে ৯ নভেম্বর কলকাতায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির প্রতিবাদ

কিট কেলেঙ্কারি ও শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে নাগরিক সভা

'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' এবং 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'-এর যৌথ আহ্বানে ৭ নভেম্বর কলকাতায় স্টুডেন্টস হলে মনোজাইম কিট কেলেঙ্কারি এবং বি সি রায় শিশু হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। কিট কেলেঙ্কারি এবং শিশুমৃত্যুতে সরকারের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং দু'টি বিষয়েই যথাযথ তদন্ত দাবি করে বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত বক্তারা বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 'মেডিকেল টিচারস্ ফোরাম'-এর সম্পাদক ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত, 'পিপলস্ হেলথ'-এর সম্পাদক ডাঃ দেবাশিস দত্ত, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক আশিসকুসুম ঘোষ, 'মেডিকেল টেক্‌নোলজিস্ট ফোরাম'-এর সম্পাদক গোবিন্দ দোলুই, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বার কাউন্সিলে'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট অমিয় চট্টোপাধ্যায়, 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র সহ সভাপতি সদানন্দ বাগল। সভায় মনোজাইম কিট কেলেঙ্কারি এবং বি সি রায় শিশু হাসপাতালে শিশুমৃত্যু বিষয়ক প্রস্তাব দু'টি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভায় ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, আইনজীবী ও সমাজের অন্যান্য অংশ বিশেষত যুবক ও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সভায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের হাতিয়ার ‘সোভিয়েত’ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে

দুনিয়ার বুকে প্রথম শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে, শ্রমজীবী জনগণের প্রথম নিজস্ব রাষ্ট্র হিসেবে ১৯১৭ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া, পরবর্তীকালে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। স্মরণীয় যে, ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের অগ্রণী অংশকে নিয়ে গড়ে ওঠা সোভিয়েতগুলিই ছিল জনগণের নিজস্ব আন্দোলনের হাতিয়ার, সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভ্রূণ। মহান মার্কসবাদী নেতা, দার্শনিক ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় এই সোভিয়েতগুলিই হয়ে উঠেছিল রুশ-বিপ্লবের এক-একটি শক্তি কেন্দ্র। সোভিয়েত গঠনের শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে ২০০৫-এর অক্টোবরে। ২০০৬-এর অক্টোবরে ১০১তম বর্ষ হয়ে গেল। সেই উপলক্ষে সোভিয়েতগুলির সৃষ্টি, বিকাশ ও ক্ষমতা দখলের ইতিহাস স্মরণ করা আজকের বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সহ যেকোন দেশেই শ্রমজীবী জনগণের শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার যে বিপ্লব — তার অন্যতম প্রাক-শর্তই হচ্ছে, এলাকায় এলাকায় নানা পেশার শ্রমজীবী জনগণের অসংখ্য সোভিয়েত গড়ে তোলা — যাকে এদেশে আমরা বলছি ‘পিপলস্ কমিটি’ বা ‘গণকমিটি’। নানান দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও বহু কমিটি ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দাবি, পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদ ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি, চাষীর জমি রক্ষা, নদীবাঁধ মেরামতি, বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ, এলাকায় মদ-জুয়া ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি নানা দাবিতে কমিটি গড়ে উঠেছে। তবে সবই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সংগঠন, নিজেদের বাঁচার তাগিদে, নিজেদের জীবন-জীবিকা বাঁচানোর তাগিদেই তাঁরা কমিটিগুলি গড়ে তুলেছেন। তাঁরা বিভিন্ন দল-মতের মানুষ হলেও, এক সাধারণ সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে চান বলেই এক-একটি গণকমিটির মধ্যে এসেছেন। সম্প্রতি হুগলি জেলার সিঙ্গুরের চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষের ‘কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’ — এই ধরনেরই একটি গণকমিটি। আবার সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামেও ছাত্র, যুব, মহিলাদের নিয়ে আলাদা আলাদা গণকমিটি তৈরি হয়েছে। যাঁরা এদেশে প্রকৃত বিপ্লবী দলের কর্মী-সংগঠক, যারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদেশে কাজ করছেন, তাঁদের লক্ষ্যই হবে এই কমিটিগুলিকে রাজনীতি-সচেতন করে গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত করে এগুলিকে বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাশিয়ার মাটিতে গড়ে ওঠা সোভিয়েতগুলির অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে এদেশের বিপ্লবী নেতা-কর্মী-সংগঠকদের গণকমিটিগুলি গড়ে তুলতে এবং যোগ্যতার সঙ্গে এগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে, প্রেরণা যোগাবে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবী বলশেভিকরা এই সোভিয়েত প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘‘সোভিয়েত আমরা সৃষ্টি করিনি। জনজীবনের যন্ত্রণা থেকেই তাদের উদ্ভব। সরাসরি জনগণের ভিতর থেকেই আমরা কর্মসূচি পেয়ে গেছি। জনগণ দাবি করেছে, ‘জমিতে চাষীদের কর্তৃত্ব চাই’, ‘কারখানার উপর শ্রমিকদের কর্তৃত্ব চাই’, ‘বিশ্বের সকলের জন্য শান্তি চাই’। সেই দাবিগুলি আমরা আমাদের ব্যানারে লিখে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়েছি। জনগণের সঙ্গে আমাদের চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত।’’

সোভিয়েতগুলি গড়ে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে — একথা ঠিক। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেই তারা শেষ হয়ে যেত, যদি রাশিয়ায় কমরেড লেনিন না থাকতেন, না থাকতো বলশেভিক পার্টি। তাঁরাই এই সোভিয়েতগুলিকে বিপ্লবের কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। রুশ বিপ্লব, বলশেভিক পার্টি ও কমরেড লেনিনের বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে সোভিয়েতগুলির বিকাশ ও পূর্ণতালাভের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

সোভিয়েত গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট

রাশিয়ায় তখন স্বৈরাচারী জার-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত। জার পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত। ১৯০৪ সালে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া পরাস্ত হয়। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধেই শুধু নিহত ও বন্দী রুশ সৈন্যসংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ। রুশ নৌবহর পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। রুশ জনগণ এ যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে, যুদ্ধ মানে তাদের জীবনের উপর নির্মম অভিশাপ, যুদ্ধের রসদ যোগাতে তাদের খাদ্যে-বস্ত্রে টান, তাদের দারিদ্র্য ও অনাহারের বাড়-বাড়ন্ত, দুর্ভিক্ষের করাল থাবা। সেই সর্বনাশা যুদ্ধে তাদের জড়িয়ে রেখেছে তাদেরই ঘাড়ে চেপে থাকা স্বৈরাচারী জারতন্ত্র। জার ভেবেছিল — যুদ্ধের অজুহাত দিয়ে ‘দেশ বিপন্ন’ আওয়াজ তুলে জনমতকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে এবং দেশরক্ষার নামে রাশিয়ার অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিদ্রোহ-বিপ্লবকে নির্মমভাবে ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধের শোচনীয় পরিস্থিতি বরং জারতন্ত্রের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধেই রাশিয়ার জনগণ আরও ক্ষিপ্ত, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল।

ধর্মঘটের ঢেউ উঠল ঐ বছরই (১৯০৪) ডিসেম্বর থেকে। প্রথমে শুরু করে বাকু-র তৈলখনির শ্রমিকরা। খনি শ্রমিকদের উপর নির্মম শোষণ রুখতে তারা খনিতে যৌথ অধিকার দাবি করল। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল লেনিনের বলশেভিক পার্টির বাকু কমিটি। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা জয়লাভ করে। তেলখনিতে যৌথ অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয় মালিকপক্ষ। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। রাশিয়ার বুকে যে ঝড় আসছে, বাকু-র ধর্মঘট ছিল তারই বজ্রনির্ঘোষ।

পরের মাসে অর্থাৎ ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে শুরু হয় পেত্রোগ্রাদের সবচেয়ে বড় কারখানা পুতিলভ-এ চারজন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১২ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট। পেত্রোগ্রাদের অন্যান্য সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানায়। ৭ জানুয়ারি পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। শ্রমিক আন্দোলন আর যাতে এগুতে না পারে সেজন্য একদিকে শ্রমিকদের উপর সৈন্য ও পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিকে পুলিশের চর পাঠিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভুয়া শ্রমিক সংগঠন গঠনের চেষ্টা চলে — যারা শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে বন্ধু সেজে শ্রমিক আন্দোলনকেই বিপথগামী করবে, শাসক জারের প্রতি শ্রমিকদের মোহগ্রস্ত করে তুলবে, বিক্ষোভে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে। শাসকশ্রেণীর এই অপচেষ্টা সেদিন সাময়িক হলেও কিছুটা সফল হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে গিয়ে মালিকশ্রেণীর দালালরা শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করে সিদ্ধান্ত করায় যে, ৯ জানুয়ারি রবিবার পেত্রোগ্রাদের ‘রুশ কারখানা সমিতি’র নেতৃত্বে শ্রমিকরা গির্জার পতাকা, ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন এবং জারের প্রতিকৃতি নিয়ে শীতকালীন প্রাসাদে জারের কাছে আবেদন পত্র পেশ করতে যাবে। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে, জার পরম দয়ালু, তিনি এই আবেদনে নিশ্চয়ই বিগলিত হবেন। বলশেভিক বিপ্লবীরা প্রথম থেকেই বলে আসছিল যে, এ ধরনের আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হবে না। কিন্তু তারা যখন দেখল শ্রমিকরা এসব কথা শুনতে রাজি নয়, মিছিল ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন ঠিক করে তারাও মিছিলে সামিল হবে।

৯ জানুয়ারি রবিবার। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের মিছিল বের হয়। উৎসবের মেজাজে শ্রমিকরা এসেছে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বাদ পড়েননি। গর্কি তাঁর ‘৯ জানুয়ারি’ লেখায় সেদিনের মিছিলকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সমুদ্র গোড়ায় ছিল শান্ত, শ্রমিকরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তারা কোন বিপ্লবী স্লোগান তোলেনি, জারের প্রশস্তি মুখে নিয়ে এগিয়েছিল। কিন্তু সেই শ্রমিকদের উপরেই জার গুলি চালাবার হুকুম দেয় এবং নৃশংস আক্রমণে সেদিন এক হাজারের ওপর শ্রমিক নিহত হয়, আহত হয় প্রায় ৫ হাজার। রাশিয়ার ইতিহাসে ১৯০৫-এর এই ৯ জানুয়ারি দিনটি ‘রক্তাক্ত রবিবার’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা ধ্বংস করবার যে মতলব জার এঁটেছিল তা বানচাল হয়ে যায়। এই ‘রক্তাক্ত রবিবার’ শ্রমিকদের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। জারের দয়া ও করুণা সম্পর্কে শ্রমিকদের মনে যে অন্ধ বিশ্বাস ছিল তা এই রক্তস্নানে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়। সব থেকে পিছিয়ে-পড়া শ্রমিকও স্পষ্ট বুঝতে পারল, আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হবার নয়। তাদের শ্বাসরুদ্ধকর অসহায় জীবনের থেকে মুক্তি পেতে হলে অস্ত্র হাতে নিতে হবে। বহুপূর্বেই বলশেভিক পার্টি তাদের যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল — তাই-ই তারা বাস্তবে ঘটতে দেখল। বলশেভিকদের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা বেড়ে গেল। অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম দিয়ে যে আন্দোলন চলছিল এবার তা রূপান্তরিত হয়ে গেল রাজনৈতিক সংগ্রামে। তার ফলে, বিপ্লবের পথ থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দেবার যে অপচেষ্টা ভিতর থেকে শুরু হয়েছিল তা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। ৯ জানুয়ারি সেই রবিবার সন্ধ্যা নামার আগেই পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক এলাকাগুলিতে রাস্তা আটকে শ্রমিকদের ব্যারিকেড খাড়া হতে থাকে। সারা দেশে জনগণ সামিল হতে শুরু করে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে। ‘স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক’ — এবার এই রাজনৈতিক স্লোগান ওঠে প্রত্যেকটি শহরের রাস্তায় রাস্তায়। সমগ্র রাশিয়া হয়ে উঠল মিছিল ও বিক্ষোভের শহর। ব্যারিকেড খাড়া হল, জারের সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলল। শত শত শ্রমিক শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন। কেবল ঐ জানুয়ারি মাসেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। রাশিয়ায় এ ঘটনা অভূতপূর্ব।

নির্বাসনে ও কারাগারে লেনিনের জীবন

রাশিয়ায় যে আসন্ন বিপ্লবের কথা লেনিন বলেছিলেন তা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু লেনিন তখন রাশিয়ায় নেই। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি তখন সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়। এটাই তাঁর প্রথম নির্বাসন নয়, এর আগেও ১৮৯৮ সালেও নির্বাসন দণ্ড চাপানো হয়েছিল তাঁর উপর। সেবার ছিলেন সাইবেরিয়ায়। সেই নির্বাসনের দিনগুলোতে বই পড়া, বই লেখা, তত্ত্বগত তৎপরতায় ব্যস্ত থাকতেন তিনি। তারও আগে ১৮৯৬-৯৭ সালে ১৪ মাসের কারাদণ্ড। জেলের মধ্যেও লেনিন কাজ করতেন অফুরন্ত। সারাদিন অবসর পেতেন না। জেলে ও বাইরে থাকা কর্মীদের সঙ্গে নানা উপায়ে সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ রাখতেন ও মত বিনিময় করতেন, নির্দেশ ও পরামর্শ পাঠাতেন। নানা তত্ত্বগত ও দর্শন বিষয়ক পড়াশুনো, প্রবন্ধ লেখা, দেশের নানা বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতেন। তাই নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতে হত রাতে ঘুমোবার আগে। লেনিন নিজেই বলেছেন, ‘ভয়ঙ্কর শীতে যখন জেলখানায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তখন ব্যায়াম করে শরীরটাকে গরম করে নিতাম। তারপর বেশ তোফা ঘুম হত।’

বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য তিনি শুধু ভাবাদর্শের দিক থেকেই নয়, দৈহিকভাবেও নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। সহকর্মী বন্ধুদের সেই শিক্ষাই তিনি দিতেন। শুধু তাই নয়, নির্বাসন থেকে ফিরে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় দাবা খেলাটি তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা নেশার মত পেয়ে বসে, ওতে বড্ড সময় নষ্ট হয়। অতি প্রিয় স্কি করাও ছেড়েছিলেন শরীর ক্লান্ত হয় বলে। এই হলেন লেনিন। বিপ্লবের সংগ্রামের পথে প্রিয় বিষয় বা প্রিয় ব্যক্তি যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে সেটা বোঝা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তা পরিত্যাগ করতেন, বিপ্লবের প্রয়োজনই ছিল তাঁর প্রয়োজন।

ছোট বোন মারিয়া ইলিনিচ্না যখন গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন তখন তাঁকে লেনিন পরামর্শ হিসেবে লিখেছিলেন ঃ ‘ যে বইগুলো হাতে আছে এমন অদলবদল করে পড়বে যাতে বৈচিত্র্য জাগে। আমার খুব ভাল মনে আছে, পড়াশুনো বা কাজের অদলবদলে — যেমন অনুবাদের পর পড়া, চিঠি লেখার পর শরীর চর্চা, গুরুগম্ভীর বইয়ের পর রম্যরচনায় খুব সাহায্য হয়।’

এক কাজ থেকে অন্য কাজ করাই ছিল লেনিনের বিশ্রাম।

নির্বাসনে থেকেও লেনিনই নেতৃত্ব দিয়েছেন রুশ বিপ্লবে

রক্তস্নাত রবিবারের বিকালে-সন্ধ্যায় যখন পেত্রোগ্রাদে ব্যারিকেড গড়ে লড়াই শুরু করেছে শ্রমিকরা তখনও লেনিন নির্বাসিত জীবনে জেনিভায়। সেখান থেকে রাশিয়ায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ রাখছেন এবং সেই অনুযায়ী বলশেভিক নেতাদের কাছে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন, রাশিয়ার পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী নিয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখে পাঠাচ্ছেন, রাশিয়ার অভ্যন্তরে মতবাদিক সংগ্রাম পরিচালনায় দিকনির্দেশ করছেন। রাশিয়ার রিপোর্ট শুনে প্রবন্ধ লিখতে বসলেন ঃ ‘রাশিয়ায় বিপ্লব’। পেত্রোগ্রাদে ৯ জানুয়ারি যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখলেন, ‘বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ। রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড লড়াই চলছে, ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে, রাইফেলের আওয়াজ, কামানের গর্জন। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, স্বাধীনতার জন্য গৃহযুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। পেত্রোগ্রাদের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে মস্কো ও দক্ষিণাঞ্চল, ককেসাস ও পোল্যান্ড। শ্রমিকশ্রেণীর স্লোগান ঃ মৃত্যু অথবা স্বাধীনতা!’ তার সঙ্গে লেনিনও স্লোগান তুললেন, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সর্বহারাশ্রেণীর অভ্যুত্থান জিন্দাবাদ!’

দেশব্যাপী এই লড়াই ও ধর্মঘটের সামনে এসে নেতৃত্বের ভূমিকায় দাঁড়ালো রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। বলশেভিক ও মেনশেভিকরা — এই পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু বাস্তবে এরা ছিল দু’টি আলাদা দল, নেতৃত্বও ছিল পৃথক। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবের পথ অনুসরণ করত, অন্যদিকে মেনশেভিকরা ছিল কেতাবি মার্কসবাদী। তাদের চিন্তা ছিল যান্ত্রিক। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরাও ছিল সংখ্যায় বিপুল ও শত শত বছর ধরে চূড়ান্তভাবে শোষিত। সংগ্রাম থেকে তারাও পিছিয়ে ছিল না। তাদের ভিতরে বিক্ষোভের বারুদ জমে ছিলই। এবার জীবন-জীবিকা এমনই বিপন্ন হয়ে উঠল যে, তারা সংঘবদ্ধভাবে অভিযান চালালো জমিদারদের বিরুদ্ধে। জমিদারি লণ্ডভণ্ড করে দিল, সারের কারখানায় হানা দিল, জমিদারদের কুঠিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। জমিদাররা ভয়ে পালিয়ে গেল শহরের দিকে।

(চলবে)

সিপিএম-এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা নিছক লোকদেখানো

একের পাতার পর

করে, দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরও বুশ-ব্লেয়াররা তাদের একটা অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেনি। যে অভিযোগের ভিত্তিতে আমেরিকার তৈরি আদালতে সাদ্দাম হুসেনের বিচার করা হ'ল, তার সাথে যুদ্ধের কোনও সম্পর্কই নেই। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যদি সে দেশের শাসক হিসাবে তিনি কোনও অপরাধ করে থাকেন, তবে তার বিচার করার অধিকার একমাত্র ইরাকের জনগণেরই আছে, বুশ-ব্লেয়ারের নয়।

আসলে ইতিহাসে চোখ ফেললেই দেখা যাবে যে, নিপীড়িত জাতি বা দেশগুলির উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখনই আগ্রাসন চালিয়েছে, তখন তা শুরুই করা হয়েছে গণতন্ত্র ও মানবতা রক্ষার নামে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই থাকে, যে দেশকে আক্রমণ করা হবে সেই দেশের বা জনগণের নেতাকে দানব ও রক্তপিপাসু বলে প্রতিপন্ন করা। এর ফল দাঁড়ায় এটাই যে, বিজয়ী মার্কিন সেনাবাহিনী যখন পরাভূত দেশটির শাসক বা জননেতার উপর অত্যাচার চালায়, স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেয়, কিংবা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করে, তখন সেই কাজগুলোও 'ন্যায্য ও ন্যায়বিচার' বলে প্রতিপন্ন করানো হয়। সাম্রাজ্যবাদী এই মিথ্যা প্রচারই যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ ও হাইতির প্রেসিডেন্ট অহিংসবাদী আরিস্তিদের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। অথচ, ঘটনা হ'ল, ইন্দোনেশিয়া থেকে চিলি, কঙ্গো সর্বত্রই আমেরিকার সার্টিফিকেট পাওয়া শাসকরা যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে তা নগ্ন স্বৈরাচারী সামরিক একনায়কতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

সাদ্দাম হুসেন স্বৈরতন্ত্রী একনায়ক ছিলেন কি ছিলেন না, তা নিয়ে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। মাথাব্যথার কারণ দেখা দিল তখনই যখন সাদ্দাম হুসেন ইরাকের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিতে রাজি হলেন না, রাষ্ট্রায়ত্ত ইরাকি তেলের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন কোম্পানিগুলিকে ছেড়ে দিলেন না, প্যালেস্তিনীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়ে মিশরের মতো ইজরায়েলের সাথে সমঝোতায় যেতে অস্বীকার করলেন। এটাই সাদ্দাম হুসেনের অপরাধ যে, তিনি আমেরিকার অধীনে নয়া বিশ্বব্যবস্থাকে মেনে নেননি। এজন্যই শুরু হয়ে যায় সাদ্দাম হুসেনকে খতম করার মার্কিনী ষড়যন্ত্র। যার থেকেই ১৯৯১ সালে ইরাক আক্রমণ, তারপর ভয়াবহ আর্থিক অবরোধের ফাঁস। এতেও ব্যর্থ হয়ে, গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির মিথ্যা ধূয়া তুলে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ আবার ইরাক আগ্রাসন। এই ইতিহাসই বলে দেয়, যুদ্ধ সাদ্দাম হুসেন করেননি। একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে আমেরিকা-ব্রিটেন। ইতিমধ্যে ২০ লক্ষের উপর ইরাকি জনগণকে তারা হত্যা করেছে, শিল্প-কাঠামোকে ধ্বংস করেছে, সুপ্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শনকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। ফলে যুদ্ধের অপরাধে বিচার ও ফাঁসি হওয়া উচিত জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বাগদাদে সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘেরা 'গ্রীন জোনে'র ভিতর আদালত বসিয়ে সাদ্দাম হুসেনের বিচার করা শুরু হয়েছিল তখনই আমরা বলেছিলাম, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছেন সাদ্দাম হুসেন। তাঁকে বন্দী অবস্থায় বিচার-নাটকের মধ্য দিয়ে খতম করে আমেরিকা চায় ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ধ্বংস করতে, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামে ফাটল ধরাতে। এই বিচারের মধ্য দিয়ে মার্কিন শাসকরা এটাই প্রতিপন্ন করতে চায় যে, তাদের হানাদারি ও ঔপনিবেশিক শাসন ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত। যার থেকে ডাহা মিথ্যা অন্য কিছু হতে পারে না।

সাদ্দাম হুসেন বা তাঁর সহযোগীদের বিচার করার কী অধিকার আছে আমেরিকার ? বিচার দূরের কথা, একজনও মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার, অবরোধ জারি করার, বোমাবর্ষণ করার, ইরাকের মানুষকে অনাহারে রাখার সামান্যতম অধিকার আমেরিকার নেই। একটা সম্পূর্ণ বে-আইনি, অপরাধমূলক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে আমেরিকা স্বাধীন ইরাককে দখল করে তার প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্যদের বন্দী করেছে।

ইরাকের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার ও তাতে সাদ্দাম হুসেনের বিচার চালাবার কোনও অধিকার আন্তর্জাতিক আইন আমেরিকাকে দেয়নি, বরং আইন ঠিক বিপরীত কথাই বলে। জেনিভা সনদে আমেরিকাও স্বাক্ষরকারী। ঐ সনদে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে, কোন দেশেই একটি দখলদার শক্তি কখনও আদালত তৈরি করতে পারবে না। তদুপরি, সাদ্দাম হুসেন ও অন্যান্য বন্দীদের যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, কারও সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জন্ম থেকেই একটি বেআইনি সংস্থা। মার্কিন দখলদার বাহিনীর প্রথম প্রশাসনিক কর্তা পল ব্রেমারই এই আইন তৈরি করেন। বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ব্রেমারই। আদালত চালাবার অর্থও দিয়েছে আমেরিকা।

বিচার চলাকালীন এর সাথে যুক্ত ৯ জনকে খুন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন সাদ্দাম হুসেনের আইনজীবী। মাত্র কিছুদিন আগেই বিচারপতি বদল করে দেওয়া হয় এই অভিযোগে যে, তিনি নাকি আদালতে সাদ্দাম হুসেনকে কথা বলার বেশি সুযোগ দিচ্ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার জন্য ৫ নভেম্বর দিনটাও বেছে নেওয়া হয়েছিল জর্জ বুশদের ইচ্ছানুসারেই। ইরাকের মানুষের হাতে মার্কিন সেনার ক্রমাগত মার খাওয়ায় আমেরিকার মধ্যে জনমত ক্রমেই যখন বুশ ও তার দল রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে প্রবল হচ্ছে, সেসময়ই ৭ নভেম্বর মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটের নির্বাচন এসে যায়। ইরাকের সাজানো আদালতে সাদ্দাম হুসেনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়ে বুশ মার্কিন নাগরিকদের দেখাতে চাইলেন যেন ইরাকে জয়ী হয়েছে আমেরিকা। কিন্তু এই মিথ্যাচার মার্কিনী জনমতকে ভোলাতে পারেনি। রিপাবলিকানদের বিপুল পরাজয় ঘটেছে। বুশের এই পরাজয় তার নীতির প্রতি বিরোধিতার প্রকাশ হলেও এর দ্বারা যাঁরা মনে করছেন, ইরাক থেকে মার্কিন সেনা হটবে বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বন্ধ হবে, তারা ভুল প্রমাণিত হতে বাধ্য। কারণ, ইরাকের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ থেকে আগ্রাসন — সবকিছুকেই নির্বাচনে জয়ী এই ডেমোক্র্যাটরা সমর্থন করেছে। ইরাক সম্পর্কে রিপাবলিকানদের থেকে আলাদা কোনও নীতি ডেমোক্র্যাটদের নেই। সর্বোপরি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি স্থির হয় ওদেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী। ভারতের বিজেপি, কংগ্রেস বা অন্যান্যদের মতো রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয়েই আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল। তবে যে মার্কিন জনমত যুদ্ধবিরোধিতায় প্রবল হচ্ছে, একমাত্র সেটাই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে আঘাত দিতে পারে।

ইরাকে আগ্রাসন থেকে সাদ্দাম হুসেনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে যখন প্রতিবাদ-বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন দুঃখের কথা যে, ভারতবর্ষে কার্যত কোনও সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে উঠল না। বিশ্বের কোথাও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন ঘটলে, এই পশ্চিমবঙ্গে জনগণ যেভাবে গর্জে উঠত, এবার তা দেখা গেল না। বস্তুত, জনগণের সেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ও তেজ আজ স্তিমিত। ভারতবর্ষের যে একচেটিয়া পুঁজি লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বাইরে আধিপত্য বিস্তার করছিল এবং ক্রমাগত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে বোঝাপড়া বাড়াচ্ছিল, বর্তমানে বিশ্বায়নের মাধ্যমে সেই বোঝাপড়াকে তারা আরও দৃঢ় করে অন্যদেশে এমনকী পশ্চিমী দুনিয়াতেও লগ্নিপুঁজি নিয়োগ আরও বাড়িয়েছে। ফলে বাজার নিয়ে দ্বন্দ্বসংঘাত থাকলেও শোষণ-লুণ্ঠনে ভারতীয় শাসকশ্রেণী মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের দোসরে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় বুর্জোয়া দল কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যরা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই বাইরের সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে। তাই সাদ্দাম হুসেনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রশ্নে বিশ্বজনমত, এমনকী পশ্চিমী মানবাধিকার সংগঠনগুলি পর্যন্ত যখন নিন্দায় মুখর, তখন ভারতের কংগ্রেস সরকার পূর্বতন বিজেপি-সরকারের মতই যে ভূমিকা নিল, তার দ্বারা কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য কাজকেই সমর্থন করা হল। অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ দল হিসাবে একদা সিপিআই ও পরে সিপিএম তিনটি রাজ্যে সরকারি গদিতে বসার পর এবং কেন্দ্রের সরকারি ক্ষমতার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর শুধু গণআন্দোলনের পথই পরিত্যাগ করেনি, তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কণ্ঠও লোক-দেখানোয় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ সরকারি ক্ষমতায় থাকতে হলে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। ফলে তারা ততটুকুই প্রতিবাদ করেছে যাতে দলের কর্মী-সমর্থকদের মনেও কোন প্রশ্ন না ওঠে, আবার দেশিবিদেশি পুঁজিও অসন্তুষ্ট না হয়।

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময় আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সিপিএম নেতাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটা মিছিল বা দুটো মিটিং ছাড়া তাঁরা কিছুই করেননি। আমরা ঠাণ্ডা পানীয় কোকাকোলা ও পেপসি বয়কট করার কথা বলেছিলাম, তাতেও তাঁরা রাজি হননি। মার্কিন মাল্টিন্যাশনালদের সন্তুষ্ট করতে সিপিএম এ পথ নিয়েছে। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন কিংবা সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএম যেসব বিবৃতি ও মিছিল করেছে, তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, দলের সৎ কর্মীদের বিভ্রান্ত করা ও সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। এ সত্য যেকেউই বুঝবেন যে, সিপিএম-এর সমর্থনের উপরে নির্ভরশীল কেন্দ্রীয় সরকার কখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সামরিক চুক্তি, পারমাণবিক চুক্তি, ইজরায়েল থেকে অস্ত্র ক্রয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে মার্কিন ও ভারতীয় সৈন্যের যৌথ মহড়া ইত্যাদি করতে পারত না যদি সিপিএম যথার্থই বাধা দিত।

এই অবস্থায় জনগণকেই এগিয়ে এসে ইরাক ও আফগানিস্তান সহ সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক লাগাতার সুসংগঠিত প্রচার ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দাবি তুলতে হবে — প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ও সহযোগীদের মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য দণ্ডাদেশ রদ করে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে ; ইরাক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্য অপসারণ করতে হবে ; উপরোক্ত দু'টি দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে ; ভারত সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বস্তরের জনগণ ও বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে আবেদন জানাই।

বালি থানায় এম এস এস-এর ডেপুটেশন

বালিতে শর্মিষ্ঠা ঘোষ ও তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষের উপর আক্রমণের ঘটনায় এ রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষত হাওড়ার এই ঘটনায় স্থানীয় সিপিএম নেতাদের সরাসরি যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে শুধু নয়, এই অপরাধীদের আড়াল করার জন্য নেতৃত্বের অপচেষ্টাও নগ্নভাবে ধরা পড়েছে, যেমন প্রকট হয়েছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা।

গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সিপিএম আশ্রিত দুর্বৃত্তরা অশালীন আচরণ করে যাচ্ছিল, এমনকী তাদের বেপরোয়া অশালীনতা এতদূর যায় যে, গভীর রাতে শর্মিষ্ঠা দেবীর ঘরের ভিতরের ছবি তোলারও তারা চেষ্টা করেছে। শর্মিষ্ঠাদেবীর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ দুর্বৃত্তদের এই আচরণের প্রতিবাদ করায় শাসক সিপিএম এবং ডিওয়াইএফ-এর রাজ্য নেতা শঙ্কর মৈত্র, জোনাল সিপিএম নেতা রবি বসু ও লোকাল কমিটির সদস্য সুদেব গুহ ঐ সমাজবিরোধীদের নিয়ে প্রসেনজিৎবাবুকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তাদের বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে প্রসেনজিৎবাবুর একটি চোখ নষ্ট হতে চলেছে।

আরও নিন্দনীয় ঘটনা হ'ল, আক্রমণকারীদের নাম দিয়ে শর্মিষ্ঠাদেবী থানায় অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ ঐ সিপিএম নেতাদের এখনও গ্রেপ্তার করেনি।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১ নভেম্বর বালি থানা কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। ৩১ অক্টোবর সংগঠনের পক্ষ থেকে শর্মিষ্ঠা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়। থানায় ডেপুটেশন শেষে জেলা সম্পাদিকা কমরেড পুতুল চৌধুরী বলেন, বালি থানা কোনও ব্যবস্থা না নিলে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে তীব্রতর আন্দোলন করা হবে।

নলহাটিতে গণডেপুটেশন

নলহাটীর গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পরিবারের রেশন কার্ড নেই। সরকারি আধিকারিকরা অন্যায়ভাবে গ্রামের মানুষদের হয়রানি করছেন। সরকারি কর্মচারীদের সাথে যোগসাজসে কিছু দালাল তৈরি হয়েছে, যারা অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগার করছে। এ সমস্যা সমাধানের দাবিতে নলহাটী ২নং ব্লকের বিডিওকে কে কে এম এস-এর প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দিলে বিডিও সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন, প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা না হলে প্রতিনিধিরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন আবুল সাহেদ, শহীদ হোসেন, কামারুদ্দিন, আবুল ঘায়ের প্রমুখ।

গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেই বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে

তিনের পাতার পর

টাকার বড় অভাব! 'টাকার' প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকার এমনভাবে প্রচার করছে যে সাধারণ মানুষ ছাড়াও বহু বুদ্ধিজীবীও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। সরকার প্রচার করছে — 'চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সরকার টাকা পাবে কোথায়?' 'সব কিছুর দাম যখন বাড়ছে, চিকিৎসার খরচও তো বাড়বে। ভর্তুকি দিয়ে আর কতদিন চলবে?' ফলে 'টাকা দিয়ে স্বাস্থ্যক্রয় ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।' এই মিথ্যাচারের জবাবে সরকারের কাছেই প্রশ্ন, এরাজ্যে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের টাকা সরকারি কোষাগারে যে জমা দিচ্ছে, তা কি পুলিশ খাতে বছর বছর বাজেটে ব্যয়বৃদ্ধি, বিধানসভা সদস্যদের বেতনভাতা বৃদ্ধি, মন্ত্রী আমলাদের বিলাস-ব্যসন, বিদেশভ্রমণ ও বিদেশে চিকিৎসা, তাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের ঋণমকুব, নানাক্ষেত্রে কর ছাড় ইত্যাদি বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়ার জন্য? শুধু মুখ্যমন্ত্রীর খুশিতে চলচ্চিত্র উৎসবে ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া স্বাস্থখাতে যে যৎসামান্য বরাদ্দ করা হয় তা নিয়েও চলে চুরি-দুর্নীতি। আসল সমস্যা তবে টাকার নয়, মূল বিষয় হল জনগণের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

বস্তুতপক্ষে যে সরকারি হাসপাতাল গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষের একটা বড় আশ্রয়স্থল ছিল, '৯০ এর দশক থেকে রাজ্য সরকার তা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করে। বিশ্বব্যাঙ্ক-আই এম এফের শর্ত অনুসারে এবং ভারতীয় পুঁজির স্বার্থে চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ কেন্দ্রীয় সরকার করে, রাজ্যও তার অনুসরণ করে। মুখে বলে আমরা বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে এ'কাজ করছি না। বাস্তবে রাজ্য সরকার নিজেই এ'কাজ শুরু করে। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জেলা সদর হাসপাতাল পর্যন্ত আউটডোর টিকিটের ওপর চার্জ চালু করে রাজ্য সরকার। এর সঙ্গে চালু করা হয়েছিল ইনডোর-আউটডোরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ, ফ্রি বেড কমিয়ে ৩০ শতাংশ পেয়িং বেড করা, হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ ১১২টি ওষুধের লিস্ট থেকে ৮০টি ছাঁটাই করা ইত্যাদি। পরবর্তী পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকার যত 'উন্নততর' হয়েছে হাসপাতালের চার্জও তার সঙ্গে তাল দিয়ে বেড়েছে, এমনকী রোগীর পথ্যের ওপর অমানবিক চার্জ চালু হয়েছে, ফ্রি বেড প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকার তার ঝোলা থেকে বেড়ালটি বের করে দিয়েছে। ২০০৪-এর ৬ অক্টোবর কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের নীতি অনুসরণ করে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ'-এর খসড়া প্রস্তাব এনে সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবাকে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। ফলে অতি দ্রুত রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সি টি স্ক্যান মেশিন বসিয়ে ব্যবসায়ীরা রোগীর পকেট কেটে মুনাফা করা শুরু করে। এই নীতির ফলে বিভিন্ন হাসপাতালের নানা বিভাগ এবং নিরাময় পলিক্লিনিক-এর মত গোটা একটি সরকারি স্বাস্থ্যসদন স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে — যেখানে আজ আর গরিব মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একইভাবে যাদবপুরের কে এস রায় টিবি হাসপাতালের ২০০ বিঘা জমি 'কে পি সি ফাউন্ডেশন' নামে অনাবাসী ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের প্রাচীনতম হুগলির মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালের কর্মচারীরা তাদের হাসপাতালটি সিপিএম মদতপুষ্ট এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে সঁপে দেওয়া আটকাতে দৃঢ়পণ লড়াই চালাচ্ছে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে তারা ৯২১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ প্রায় ১২০০টি গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পলিসি'কে আইনে পরিণত করে যেভাবে প্রশাসনিক কৌশলে সুচতুর উপায়ে নিঃশব্দে ও দ্রুততার সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ ঘটাচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিকে সোসাইটি অ্যাক্টের আওতায় এনে সেগুলিকে স্বশাসিত সেল্ফ ফিনান্সিং 'স্বাস্থ্য সমিতি' হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছে। তার অধীনে থাকছে 'রোগী কল্যাণ সমিতি' এবং 'মেডিকেল এডুকেশন কমিটি।' সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ স্বাস্থ্যসমিতিগুলিকে দেওয়া থাকছে সম্পদ সংগ্রহের অবাধ স্বাধীনতা। তারা মনে করলে, তাদের পরিচালকদের বকলমে সরকার হাসপাতালের সম্পত্তি বিক্রি করতে, লিজ দিতে বা যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে। 'রোগী কল্যাণ সমিতি' এবং 'মেডিকেল এডুকেশন কমিটি' রোগীর চিকিৎসার এবং ছাত্রদের ডাক্তারি পড়ার টাকা কত নেওয়া হবে তা ধার্য করবে। এইভাবে সরকার আপাতত মহকুমা স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু করে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজের আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে ষোল আনা বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করছে। এর ফলে রাজ্যের গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের চিকিৎসার প্রধান আশ্রয়স্থল সরকারি হাসপাতালের দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেডিকেল শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের মাপকাঠি হচ্ছে শুধুমাত্র টাকা, মেধা নয়। ফলে গ্রাম-শহরের গরিব মেধাবী ছাত্রদের সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মেডিকেল কলেজের দরজাগুলি। সরকারি কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে এইভাবে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ খোলার ঢালাও অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। 'মনোজাইম কিট' এর ব্যবসায়ী গোবিন্দ সারদা এবং অসাধু মালিকগোষ্ঠী, ঠিকাদার, ব্যবসায়ীরা জানে এই রাজ্যে তাদের বন্ধু সরকার আছে। তাই মানুষের জীবন সংহারক জাল কিট সরকারি ব্লাডব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চালাতে তাদের অসুবিধে হবে না। কোনরকমে ফাঁস হয়ে গেলেও চিন্তার বিশেষ কারণ নেই, দলের নেতারাই ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবেন। সংবাদে প্রকাশ, গোবিন্দ সারদা ধরা পড়ার পর সিপিএম-এর প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা তাকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্নীতিবাজ এইসব ব্যবসায়ীরা সিপিএম শাসনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, প্রবল জনবিক্ষোভের সামনে সরকার মানুষকে স্তোক দিতে হয়ত একটা তদন্ত কমিটি-র মতো কিছু করবে; নিরপেক্ষ তদন্ত করতে সরকার বাধ্য হলেও তার রিপোর্ট কোনদিনই মানুষ জানতে পারবে না, আর প্রশাসনিক বা পুলিশি তদন্ত হলে প্রকৃত দোষীকে আড়াল করতে অতি সাধারণ স্তরের দু-একজন অফিসার বা কর্মচারীর ওপর কোপ পড়তে পারে। ফলে একদিকে দুর্নীতিকে সযত্নে লালন করা অন্যদিকে গোটা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকেই ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে সার্বিক বেসরকারীকরণ ঘটানো — সরকারের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করতে রাজ্যব্যাপী প্রবল গণআন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে। এই আন্দোলনের চাপেই সরকারকে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ-ব্যবসায়ীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য করা যাবে। স্বাস্থ্যকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা, সরকার গঠিত 'হাতি কমিটি' ১৯৭৫ সালে যে রিপোর্ট সরকারকে দিয়েছিল যার মধ্যে ছিল — মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ এবং সরকারি সংস্থা তৈরি করা; ১১৭টি অত্যাবশ্যক ওষুধের নথিভুক্তিকরণ এবং তার সরবরাহ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি সুপারিশ — তা মানতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। চিকিৎসক, সর্বস্তরের স্বাস্থ্যকর্মী ও জনগণকে নিয়ে সুচিকিৎসার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'। সেই আন্দোলনকে উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে গড়ে তুলে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যোগ্য জবাব জনগণকেই দিতে হবে।

বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে আমরণ অনশন

একের পাতার পর

অনশন শুরু হয়। ঐ সময় প্রায় দশ হাজার মানুষের এক সংগ্রামী জনতা অনশনকারীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানায়।

২ নভেম্বর প্রায় ৮০০০ মা-বোনের এক সমাবেশ অনশনকারীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অনশন মঞ্চের সামনে অবস্থান করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস দীপ্তি সরকার, মাধবী প্রামাণিক, মাধবী পণ্ডিত প্রমুখ।

৩ নভেম্বর সকাল থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ জামতলায় অবস্থিত কুলতলি বিডিও অফিসের মাঠে জমায়েত হতে থাকেন। জামতলা হাট থেকে বিডিও অফিসের মাঠে তিলধারণের জায়গা ছিল না। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

গণবিক্ষোভের এই খবর পৌঁছে যায় সরকারি মহলে। শুরু হয়ে যায় তৎপরতা। ছুটে আসেন এস ডি ও, জয়েন্ট বিডিও, এস ডি এল এল আর ও এবং বি এল এল আর ও'র মতো অফিসাররা। তাঁরা অনশনকারীদের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। অনশনকারীদের পক্ষ থেকে কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে কমরেডস্ সহদেব মণ্ডল, মনোরঞ্জন পণ্ডিত, পঙ্কজ মণ্ডল, মোসলেম সরদার এবং প্রদীপ হালদার আলোচনায় অংশ নেন। দীর্ঘ আলোচনার পর মহকুমা শাসক প্রতিটি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং ৪ নভেম্বর থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর জয়েন্ট বিডিও এবং বি এল এল আর ও অনশন মঞ্চে এসে লিখিত প্রতিশ্রুতি বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের হাতে তুলে দেন এবং অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

অনশনস্থলে উপস্থিত হয়ে জয়নগরের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার অনশনকারীদের হাতে ফলের রস তুলে দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান।

পাট্টাদার-বর্গাদারদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায় হওয়ায় কুলতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুশির হাওয়া বয়ে যায়। জয়ের আনন্দে উদ্দীপ্ত মানুষ ঘরে ফেরার সময় বলতে বলতে যান — 'লড়াই ছাড়া পথ নেই, এস ইউ সি আই ছাড়া দল নেই।'

কুলতলিতে আমরণ অনশনকারীরা

হলদিয়ার কৃষকরাও উচ্ছেদ রুখতে সংগঠিত হচ্ছেন

সম্প্রতি রাজ্য সরকার হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকার ৬টি থানার ১৭৪টি মৌজায় স্পেশাল ইকনমিক জোন, কুঁকড়াহাটিতে টাউনশিপ এবং নন্দীগ্রামে মেগা কেমিক্যাল হাব করার জন্য জমি চিহ্নিতকরণ শুরু করেছে। সরকারের এই প্রচেষ্টার প্রতিবাদে এলাকায় দলমতনির্বিশেষে বিভিন্ন কমিটি গড়ে উঠেছে। এই কমিটিগুলিকে যুক্ত করে 'হলদিয়া মহকুমা বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষা যুক্তকমিটি' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিটির পক্ষে যুগ্ম আহ্বায়ক নন্দ পাত্র ও নারায়ণ প্রামাণিক জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন কমিটিগুলিকে যুক্ত করে তাঁরা ২ নভেম্বর মঞ্জুশ্রী মোড়ে অবস্থান এবং হলদিয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন বাতিল করতে হবে; নগরায়ন, শিল্পায়নের নামে কৃষি ও বাস্তুজমি অধিগ্রহণ করা চলবে না; অধিগ্রহণের পূর্বে জমির ব্যবহার নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে; বাঁচার বিকল্প ব্যবস্থা না করে কাউকে উচ্ছেদ করা চলবে না; পূর্বের উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন, চাকরি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বকেয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মহকুমা শাসকের কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে তাঁদের অভিযোগ — সরকার ২/৩ ফসলি জমিকেও এক ফসলি বলে চিহ্নিত করেছে। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হলদিয়া বন্দর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উচ্ছেদ হওয়া হাজার হাজার পরিবার চাকরি, পুনর্বাসন পায়নি। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলে অভিহিত করে শ্রমিক-কৃষকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। রাসায়নিক কারখানার ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়বে। নগরায়নের নামে ব্যাপক কৃষক উচ্ছেদ হবে। এইসব প্রকল্প কার্যকর হলে ১৭৪টি মৌজার চার/পাঁচলক্ষ দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক, মৎস্যজীবী মানুষ অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে। চাষযোগ্য জমি থাকবে না। জনবিরোধী এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে শাখা কমিটি গড়ে তোলার আবেদন জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন — প্রাক্তন বিধায়ক শিবনাথ দাস, প্রফুল্ল কুমার মাইতি, শ্রীকেশ প্রামাণিক, শুভেন্দু দাস প্রমুখ।

নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে জনসভা

দিল্লি

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই-এর দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে ৭ নভেম্বর নিউ দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশ' কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী নভেম্বর বিপ্লবের অমূল্য শিক্ষাগুলি উল্লেখ করে বলেন যে, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বর্তমান তথাকথিত 'একমেরু' বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ নৃশংস দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লির সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

তিনি বলেন, মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সফল নভেম্বর বিপ্লব এ'কথাই প্রমাণ করেছিল যে, সমাজতন্ত্র কল্পনা নয়। নভেম্বর বিপ্লব এ-ও দেখিয়েছিল যে, বিপ্লবী আদর্শগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ মেহনতি মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে। লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু পূর্বেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদের যে চর্চা চলছে, সময় থাকতে তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সোভিয়েট ইউনিয়নে এমনকী পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যর্থতা নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নসহ অন্য দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের মূল কারণ হ'ল সংশোধনবাদ — অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের যে প্রভাব গোটা বিশ্বের মেহনতি মানুষের ওপর পড়েছিল, তার ফলে নানা দেশে বিপ্লব সফল করার মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠেছিল, যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষের ওপর সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান জানান।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল। রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল সহ রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত ইরাকের পুতুল সরকার স্বাধীন, সার্বভৌম ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে সাজানো ও মিথ্যা বিচারের মধ্য দিয়ে যেভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করে সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহার

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে পাটনার আই এম এ হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধানবক্তা এস ইউ সি আই-এর বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর বলেন, ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছিল। সেই বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে আমেরিকা সহ সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ-জুলুমের অবসান ঘটাতে আজ এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। সেই বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

পাটনার সভায় বলছেন কমরেড শিবলাল যাদব

সাদ্দাম হুসেনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সভায় পেশ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিংহ এবং উত্তর কোরিয়ার উপর সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে অপর একটি প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড এম কে পাঠক। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাটনা জেলা সম্পাদক কমরেড শিবলাল প্রসাদ।

সিঙ্গুর সহ রাজ্যের সর্বত্র কৃষিজমি থেকে কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদার উচ্ছেদ ও শহরাঞ্চলে জমির উর্ধ্বসীমা শিথিলের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত প্রতিরোধে

২৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার

গণঅবস্থান সফল করুন

সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি

স্থান ঃ এসপ্ল্যানেড, কলকাতা, সময় ঃ ১২টা

ঝাড়খণ্ড

জনস্বার্থবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা সংগঠিত হচ্ছেন

''ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি পাঁচ বছর আগে গঠিত হলেও আজও পর্যন্ত এখানে শিক্ষার কোন সিলেবাস নেই, পাঠ্য বইপত্রও নেই। শিক্ষার কোন পরিকাঠামোই রাজ্য সরকার গড়ে তোলেনি। এর প্রতিবাদে সেভ এডুকেশন কমিটির আন্দোলন গ্রামীণ স্তর থেকে ব্লক স্তর হয়ে জেলায় জেলায় সংগঠিত করতে হবে'' — গত ৪ নভেম্বর ঘাটশিলায় ঝাড়খণ্ড সেভ এডুকেশন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের অনুষ্ঠানে সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে একথাগুলি বলেন বিজয় প্রসাদ পীযূষ।

সারা দেশে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে ঝাড়খণ্ড অন্যতম। তাই সুষ্ঠু ও জনস্বার্থবাহী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে রাজ্য জুড়ে, জেলা স্তরে ও ব্লক স্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গঠিত হচ্ছে সেভ এডুকেশন কমিটি। ৪ নভেম্বর রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে ঘাটশিলায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেভ এডুকেশন কমিটির প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাটশিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী মিত্রেশ্বর। বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক প্রীতম সরেন। ঘাটশিলা কলেজের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক দোলগোবিন্দ প্রসাদ লোহানী তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার বেসরকারীকরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মাড়োয়ারি হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বি কচ্ছপ বলেন, স্কুল স্তরের বর্তমান পরিকাঠামো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। বক্তব্য রাখেন ঘাটশিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নরেশ কুমার সহ ঘাটশিলার বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কানাই বারিক বক্তব্য রাখেন। পূর্ব সিংভূম জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক সুমিত রায় সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যে এই কমিটির কাজের সাফল্য তুলে ধরেন। সভাপতি অধ্যাপক মিত্রেশ্বর ঘাটশিলা কলেজে বি এড শিক্ষা চালু করার দাবি করেন এবং ঘাটশিলা কলেজের জমি বিক্রির কাজের তীব্র নিন্দা করেন।

সর্বশেষে আগামী কনভেনশনের আহ্বায়িকা হিসাবে মাড়োয়ারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বি কচ্ছপকে নির্বাচিত করে ১৯ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে।

ওড়িশায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ওয়ার্কশপ

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ওড়িশা শাখার উদ্যোগে ২৯ অক্টোবর ভুবনেশ্বরে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আবাসনের কমিউনিটি হলে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ওয়ার্কশপ চলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। প্রধান অতিথি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীরেন্দ্রকুমার নায়েক ও বিশেষ অতিথি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতা কমরেড রঘুনাথ দাস বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড গৌরীশঙ্কর দাসও ওয়ার্কশপে বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা শাখার সভাপতি কমরেড ভাস্কর জেনা।

নাবার্ড, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই, আই ডি বি আই, আর বি আই, সিড্‌বি, কলিঙ্গ গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, এস বি আই, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কর্মচারীরা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

খড়্গপুরে কৃষকদের শপথ

একের পাতার পর

বেশিরভাগ জমিতেই শিল্প কারখানা না হয়ে উপনগরী গড়ে উঠেছে; এছাড়া যতটুকু শিল্পও হচ্ছে তা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে যতজন কৃষিকাজ হারিয়েছেন তার এক শতাংশেরও ঐ শিল্পে কাজ জোটেনি। জমিহারাদের চাকরির প্রতিশ্রুতি রক্ষা দূরের কথা, জমির দাম হিসাবে প্রাপ্য টাকাটুকুও পাননি অনেকেই। যখন রাজ্যের ৫৫ হাজারেরও বেশি কলকারখানা বন্ধ এবং তার ফলে ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মচ্যুত, তখন বেকার যুবকদের জন্য মায়াকান্না কেঁদে শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে কৃষি জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের পরিকল্পনা গরিব শোষিত মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছুই নয়। টাটা শিল্প গড়লে বেকারদের চাকরি হবে, রাজ্যের উন্নয়ন হবে, জমি নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের এই আশ্বাসবাণী যে পুরোপুরি লোকঠকানো তা পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের দিকে তাকালেই দেখা যায়। ঐ রাজ্যের জামসেদপুরে টাটাদের কারখানার বয়স একশো বছর পার হলেও ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনরকম উন্নতি হয়নি। অথচ ঐ কারখানার লাভের মধ্য দিয়ে টাটার সম্পদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা সফল হলে টাটাদের এবং কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও এলাকার কৃষক, খেতমজুর সহ সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে ডুববে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই কারণেই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ জমি অধিগ্রহণ রুখতে সবরকম সরকারি দমনপীড়ন অগ্রাহ্য করে মরণপণ লড়াইয়ে সামিল। এখানেও ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

বাঁদিকে ঃ উপর থেকে ঃ চেন্নাই (তামিলনাড়ু), অনন্তপুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), ভুবনেশ্বর (ওড়িশা), রাঁচি (ঝাড়খণ্ড)
ডানদিকে ঃ উপর থেকে ঃ পাটনা (বিহার), গৌহাটি (আসাম), এরনাকুলাম (কেরালা), বাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in